fatwaa.org

সরকারি চাকরি করা কি বৈধ?

verdict

17 - 21 minutes

সরকারি চাকরি করা কি বৈধ?

শায়খ হাবিবুল্লাহ নাদিম হাফিজাহুল্লাহ

তাগুত পরিচিতি

ইমাম মালিক রহ. ও ইমাম বাগাবি রহ. বলেন, আল্লাহ ব্যতিরেকে যাদের ইবাদত করা হয়, তাদের সবাইকে তাগুত বলা হয়।[1] কাজি সানাউল্লাহ পানিপথি রহ. লেখেন, তাগুত হলো আল্লাহ ছাড়া অন্য সকল উপাস্য এবং সেসব জিন শয়তান বা মানুষ শয়তান, যারা আল্লাহর ইবাদতের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে।[2] মুফতি কেফায়াতুল্লাহ রহ. ব্রিটিশ আইনের অধীনে শাসন ও বিচারকার্য পরিচালনাকারী প্রত্যেক অমুসলিম ও নামধারী মুসলিমকে তাগুত বলে আখ্যায়িত করেছেন।[3]

তাগুতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতা

ইসলাম ও জাহিলিয়াতের মধ্যে শতভাগ বৈপরীত্য বিদ্যমান। যেখানে ইসলাম থাকবে, সেখানে জাহিলিয়্যাত থাকবে না। আর যেখানে জাহিলিয়্যাত থাকবে, সেখানে ইসলাম থাকবে না। যেহেতু ইসলামের ব্যাপ্তি সব সময়ে ও সব জায়গায় বিস্তৃত, সুতরাং জীবনের সবক্ষেত্রে সর্বদাই জাহিলিয়্যাতের সঙ্গে তার দ্বন্দ্ব প্রতিষ্ঠিত। এই দ্বন্দ্ব চিরন্তন। জাহিলিয়্যাতের রয়েছে অনেক শাখা-প্রশাখা। কুফর, শিরক, পাপাচার সবই জাহিলিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত। এ জন্যই ইমাম বুখারি রহ. তার *সহিহ* গ্রন্থে একটি অধ্যায়ের শিরোনাম দিয়েছেন এভাবে :

المَعَاصِي مِنْ أَمْرِ الجَاهِلِيَّةِ

গোনাহ জাহিলি বিষয়াবলির অন্তর্ভুক্ত।

এর পক্ষে তিনি রাসুলুল্লাহর ﷺ একটি হাদিস প্রমাণস্বরূপ উল্লেখ করেন :

إِنَّكَ امْرُؤٌ فِيكَ جَاهِلِيَّةٌ

তুমি তো এমন একজন মানুষ, যার ভেতরে জাহিলিয়্যাত রয়েছে।

এ কারণেই ইসলাম সর্বপ্রথম জাহিলিয়্যাতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করায়, এরপর ব্যক্তির ইমানের

স্বীকারোক্তি গ্রহণ করে। তাওহিদের কালিমার দিকে লক্ষ করলেই এই বাস্তবতা পরিষ্কার হয়ে ওঠে। ‘নেই কোনো ইলাহ আল্লাহ ছাড়া’। প্রথমে জাহিলিয়্যাতের বাস্তবায়নকারী ও প্রতিরক্ষাকারী তাগুতের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হচ্ছে। এরপর আল্লাহর উলুহিয়্যাতের ঘোষণা গৃহীত হচ্ছে। কুরআন মাজিদেও আমরা একই বিন্যাস দেখতে পাই :

فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لَا انْفِصَامَ لَهَا

যে তাগুতকে প্রত্যাখ্যান করে এবং আল্লাহর ওপর ঈমান আনয়ন করে, সে তো মজবুত রশি আঁকড়ে ধরে, যা ছিন্ন হবার নয়।[4]

ইসলাম শুধু জাহিলিয়্যাতের নিকটে যেতেই নিষেধ করেনি; বরং জাহিলি কর্মকাণ্ডে কাউকে সাহায্য করতেও নিষেধ করেছে।

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ

তোমরা গোনাহ ও সীমালঙ্ঘনের ব্যাপারে পরস্পরকে সহযোগিতা করো না।[5]

এই আয়াতের প্রায়োগিক নমুনা আমরা আল্লাহর রাসুল ﷺ-এর জীবনীতেও দেখতে পাই। জাহিলিয়্যাতের সঙ্গে সম্পর্কহীনতার অংশ হিসেবে তিনি যেকোনো জাহিলি কর্মকাণ্ডে পারস্পরিক সহযোগিতাও কঠিনভাবে নিষিদ্ধ করেছেন। যেমন, জাবির রা. বর্ণনা করেন :

«لَعَنَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ آكِلَ الرِّبَا، وَمُؤْكِلَهُ، وَكَاتِبَهُ، وَشَاهِدَيْهِ»، وَقَالَ: «هُمْ سَوَاءٌ»

রাসুলুল্লাহ ﷺ সুদের গ্রহীতা, দাতা, লেখক ও সাক্ষীদ্বয়কে অভিশাপ দিয়েছেন এবং তিনি বলেছেন, ‘এরা সকলেই সমান’।[6]

আবদুল্লাহ ইবনু উমর রা. বর্ণনা করেন, রাসুলুল্লাহ ﷺ বলেছেন :

لَعَنَ اللَّهُ الْخَمْرَ، وَشَارِبَهَا، وَسَاقِيَهَا، وَبَائِعَهَا، وَمُبْتَاعَهَا، وَعَاصِرَهَا، وَمُعْتَصِرَهَا، وَحَامِلَهَا، وَالْمَحْمُولَةَ إِلَيْهِ

মদ, মদ পানকারী, পরিবেশনকারী, বিক্রেতা, ক্রেতা, উৎপাদক ও শোধনকারী, যে উৎপাদন করায়, সরবরাহকারী এবং যার জন্য সরবরাহ করা হয়—এদের সকলকে আল্লাহ লা‘নত করেছেন।[7]

এই হাদিস দুটো নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করলে বোঝা যায়, ইসলাম জাহিলিয়্যাতের সঙ্গে কতটা দূরত্ব বজায় রাখা কামনা করে। কোনো মুসলমানের দ্বারা জাহিলি কোনো কাজ প্রতিষ্ঠিত থাকবে—ইসলাম এটা কখনোই সমর্থন করে না। জাহিলি যুগের মুশরিকদের কাছে সুদ খুব স্বাভাবিক একটা ব্যাপার ছিল; এমনকি কুরআনেও এর বর্ণনা এসেছে :

قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

তারা বলে, সুদ তো ব্যবসার মতো। অথচ আল্লাহ ব্যবসা হালাল করেছেন এবং সুদকে করেছেন হারাম।[8]

মদের ব্যাপারেও কুরআন জানাচ্ছে :

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا

তারা আপনাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। আপনি বলুন, এ দুটোতে বড় গোনাহ ও মানুষের জন্য বহুবিধ উপকার রয়েছে। আর এর গোনাহ এর উপকারের চাইতে গুরুতর।[9]

এই আয়াতের আলোকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হলো যে, কোনো জিনিসের মধ্যে যদি অনেক উপকারও থাকে, কিন্তু তা জাহিলিয়্যাতের অন্তর্ভুক্ত হয়, তাহলে একজন মুসলমানের জন্য তা নিষিদ্ধ বলেই বিবেচিত হয়। মানবহত্যা, নারী ও শিশু ধর্ষণ ইত্যাদির জঘন্যতা তো সুস্পষ্ট; কিন্তু তৎকালীন যুগে যেহেতু সমাজ ও অর্থনীতিতে সুদের ব্যাপক প্রচলন ছিল এবং সর্বস্তরের মানুষের মধ্যে মদ পানির মতোই একটি স্বাভাবিক বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছিল, এ জন্য শরিয়ত এ দুটোকে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করেছে। জাহিলিয়্যাতের এই প্রতীকগুলোর সঙ্গে দৃঢ়ভাবে সম্পর্ক ছিন্ন করতে নির্দেশ দিয়েছে। কা'ব আহবার বলেন :

دِرْهَمٌ رِبًا يَأْكُلُهُ الرَّجُلُ وَهُوَ يَعْلَمُ، أَشَدُّ مِنْ سِتَّةٍ وَثَلَاثِينَ زَنْيَةً

জেনেবুঝে কোনো ব্যক্তি এক দিরহাম সুদ খাওয়া ছত্রিশ বার ব্যভিচার করা অপেক্ষা গুরুতর।[10]

রাসুলুল্লাহ ﷺ থেকে বর্ণিত হয়েছে :

مُدْمِنُ الْخَمْرِ إِنْ مَاتَ، لَقِيَ اللهَ كَعَابِدِ وَثَنٍ

নিয়মিত মদপানে অভ্যস্ত ব্যক্তি মারা গেলে সে আল্লাহর সঙ্গে এমনভাবে সাক্ষাৎ করবে, যেন সে একজন মূর্তিপূজারী।[11]

যেখানে জাহিলিয়্যাতের একেকটা প্রতীকের ক্ষেত্রেই ইসলামের এই অবস্থান, সেখানে এর বাস্তবায়নকারী ও প্রতিরক্ষাকারী তাগুতের ব্যাপারে ইসলাম কতটা কঠোর হবে—তা সহজেই অনুমেয়।

তাগুতি শাসনব্যবস্থার পরিচয়

কোনো বস্তুকে তার বৈশিষ্ট্য দ্বারা চেনা যায়। তাগুতি শাসনব্যবস্থার মৌলিক বৈশিষ্ট্য হলো, এতে হাকিমিয়্যাত তথা আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণয়নের অধিকার আল্লাহ তাআলাকে দেওয়া হয় না। আইনের উৎস কুরআন ও সুন্নাহকে মানা হয় না। দেওয়ানি ও ফৌজদারি বিধিসমূহ ইসলাম থেকে গ্রহণ করা হয় না। কোনো বিধি যদি বাহ্যিকভাবে ইসলামের সঙ্গে মিলেও যায়, তা নিরেট কাকতালীয় ব্যাপার ছাড়া কিছু হয় না। বৈধ-অবৈধ, সিদ্ধ-নিষিদ্ধ আখ্যা দেওয়ার ক্ষেত্রে রাসুলুল্লাহ ﷺ-এর শরিয়ত বিবেচনা করা হয় না। জীবনের সবক্ষেত্রে ক্ষমতাধরদের ফায়সালাই চূড়ান্ত ফায়সালা হিসেবে বিবেচিত হয়; এমনকি এর অন্যথা করা হলে তা ইসলামসম্মত হলেও তাদের বিচারে আইনত দণ্ডনীয় হিসেবে গণ্য হয়। এমনকি মুসলমানদের অভ্যন্তরীণ কিছু ব্যাপারে (পারসোনাল ল) যদি ইসলামের ওপর আমল করার স্বাধীনতা থাকে, তা-ও মুসলমানরা আল্লাহপ্রদত্ত অধিকার হিসেবে পায় না; বরং তাগুতি শাসনব্যবস্থা অনুগ্রহস্বরূপ তাদেরকে এর সুযোগ দিয়েছে বলেই তারা এই অধিকার লাভ করে। এককথায়, তাগুতি শাসনব্যবস্থায় সংবিধান, মন্ত্রণালয়, সংসদ, আদালত সবকিছুই রচিত ও পরিচালিত হয় মানবরচিত বিধান অনুসারে; শরিয়াহ নির্দেশিত নীতি অনুসারে নয়।

আল্লাহ তাআলা কুরআনে এই উম্মাহর শ্রেষ্ঠত্বের যে চারটি কারণ উল্লেখ করেছেন তার মধ্যে অন্যতম হলো, 'মারুফ'র আদেশ করা এবং 'মুনকার' থেকে নিষেধ করা।[12] যার কারণে এই দুটো গুণকে

আল্লাহ তাআলা মুসলমানদের অনন্য বৈশিষ্ট্য বলে আখ্যায়িত করেছেন।[13] অপরদিকে 'মারুফ' থেকে নিষেধ করা এবং 'মুনকার'র আদেশ করাকে আল্লাহ মুনাফিকদের বৈশিষ্ট্য বলে ঘোষণা দিয়েছেন।[14] 'মুনকার'র পরিচয় প্রসঙ্গে ইমাম রাগিব ইস্পাহানি রহ. বলেন, শরিয়াহ বা বিবেক যা প্রত্যাখ্যান করে, তা-ই মুনকার।[15] সুতরাং 'নাহি আনিল মুনকার' মানে কেবলই মাদক, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি থেকে নিষেধ করা নয়; বরং এগুলো তো অনেক পরের ধাপ। এর প্রথম ধাপই তো হলো, জাহিলিয়্যাত থেকে নিষেধ করা, তাগুতি শাসনব্যবস্থা থেকে মানুষকে বারণ করা। আর আল্লাহ তাআলা আমাদেরকে শুধু নিষেধই করতে বলেননি; প্রতিরোধও করতে বলেছেন।

يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ جَاهِدِ الْكُفَّارَ وَالْمُنَافِقِينَ وَاغْلُظْ عَلَيْهِمْ

হে নবি, আপনি কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করুন এবং তাদের বিরুদ্ধে কঠোর হোন।[16]

শুধু তা-ই নয়। যারা কাফির ও মুনাফিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করে না, জিহাদ করার ইচ্ছাও রাখে না, রাসুলুল্লাহ ﷺ তাদের মধ্যে নিফাক আছে বলেছেন।

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَغْزُ، وَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ نَفْسَهُ، مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنْ نِفَاقٍ

যে ব্যক্তি এমতাবস্থায় মারা গেল যে, সে জিহাদ করেনি এবং অন্তরে জিহাদের ইচ্ছাও লালন করেনি, সে নিফাকের উপর মারা গেল।[17]

সরকারি চাকরি : তাগুতি শাসনব্যবস্থার সহযোগিতা

তাগুতি শাসনব্যবস্থার অধীনে সরকারি চাকরি করা তাগুতকে সহযোগিতা করার নামান্তর। কারণ, এসব চাকুরেদের সহযোগিতায়ই তাগুত তার শাসনকার্য পরিচালনা করে। এই সহযোগিতা দু-ধরনের হয়ে থাকে : (ক) মৌলিক, (খ) শাখাগত। মৌলিক সহযোগিতার উদাহরণ হলো, সংবিধান প্রণয়ন বা তা বাস্তবায়নে অংশগ্রহণ করা কিংবা আইনকানুন, বিধিবিধান ও নীতিমালা রচনা করা, রক্ষণাবেক্ষণ করা এবং তা কার্যকরকরণে ভূমিকা রাখা। শাখাগত সহযোগিতার উদাহরণ হলো, তাগুতি শাসনব্যবস্থার অধীনে অন্যান্য চাকরিবাকরি। শাখাগত সহযোগিতার অন্তর্ভুক্ত চাকরিসমূহকেও দু-ভাগে ভাগ করা যায় : (ক) এমন চাকরি, যা সত্তাগতভাবে হারাম। যেমন, আদালতের চাকরি, সুদী ব্যাংকের চাকরি, ইসলামের বিজয় ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্যে গঠিত বাহিনীর চাকরি ইত্যাদি। (খ) এমন চাকরি, যা সত্তাগতভাবে হারাম নয়। যেমন, হাসপাতালের ডাক্তারি, বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা, ডাকবিভাগের চাকরি ইত্যাদি। এখন আমরা প্রতিটি প্রকারের বিধান স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ করব। তবে প্রতিটির স্বতন্ত্র আলোচনায় যাওয়ার আগে কুরআন মাজিদের একটি আয়াত উল্লেখ করব, যা আমাদের বক্ষ্যমাণ আলোচনার সঙ্গে প্রাসঙ্গিক :

وَلَا تَرْكَنُوٓاْ إِلَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ فَتَمَسَّكُمُ ٱلنَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ ٱللَّهِ مِنْ أَوْلِيَآءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ

আর যারা জুলুম করেছে তোমরা তাদের প্রতি ঝুঁকে পড়ো না; অন্যথায় আগুন তোমাদেরকেও স্পর্শ করবে এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনো অভিভাবক থাকবে না। তারপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না।[18]

এই আয়াতটি আমাদের আলোচনার সঙ্গে কতটা প্রাসঙ্গিক, তা বুঝতে হলে এর সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যার দিকে দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। বস্তুত এ আয়াতে মানুষকে ক্ষতি ও ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ

নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বলা হচ্ছে, ওইসব জালিমদের দিকে একটুও ঝুঁকবে না, তাহলে কিন্তু তাদের সাথে সাথে তোমাদেরকেও জাহান্নামের আগুন স্পর্শ করবে। এখানে তাদের প্রতি সামান্যতম ঝোঁকা বা আকৃষ্ট হওয়া এবং তাদের প্রতি আস্থা বা সম্মতি জ্ঞাপন করাও নিষেধ করা হয়েছে। এই ঝোঁকা ও আকর্ষণের অর্থ সম্পর্কে সাহাবি ও তাবেয়িগণের বেশ কিছু উক্তি বর্ণিত হয়েছে, যার কয়েকটির দিকে লক্ষ করলেই এর আলোকে আমাদের আলোচ্য বিষয়ের সঙ্গে এই আয়াতের প্রাসঙ্গিকতা সুস্পষ্ট হয়ে যাবে।

সাহাবি আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. বলেন, জালিমদের চাটুকার হবে না। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, তাদের শিরকি কর্মকাণ্ডের পক্ষপাতিত্ব করবে না।[19]

কাতাদা রহ. বলেন, এর অর্থ হলো, পাপিষ্ঠদের সঙ্গে বন্ধুত্ব করবে না, তাদের কথামতো চলবে না।[20]

ইবনু জুরাইজ রহ. বলেন, এর অর্থ হলো, পাপিষ্ঠদের প্রতি আদৌ আকৃষ্ট হবে না।[21]

আবুল আলিয়া বলেন, তাদের কার্যকলাপ ও কথাবার্তা পছন্দ করবে না।[22]

সুদ্দি রহ. বলেন, জালিমদের চাটুকারিতা করবে না।

ইকরিমা রহ. বলেন, তাদের আনুগত্য করবে না।[23]

ইবনু যায়দ রহ. বলেন, তাদের কুফরি কর্মকাণ্ডের বিরোধিতা করা পরিত্যাগ করবে না।[24]

আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস রা. থেকে অপর বর্ণনায় এসেছে, তোমরা জালিমদের পক্ষ নিয়ো না, তাদের সাহায্য গ্রহণ করো না, তাহলে মনে হবে যেন তোমরা তাদের অন্যান্য কর্মকাণ্ডের প্রতি সন্তুষ্ট রয়েছে।[25]

তাছাড়া বাহ্যিক আকৃতি-প্রকৃতিতে, লেবাস-পোশাকে, চাল-চলনে তাদের অনুকরণও এ নিষেধাজ্ঞার আওতাভুক্ত হবে। ইবনু যায়দ রহ. বলেন, এখানে জালিম বলে কাফিরদেরকে বোঝানো হয়েছে।[26] কিন্তু মুমিনদের মধ্যে যারা জালিম হবে, তাদের সাথে সম্পর্ক বিভিন্ন অবস্থার ওপর নির্ভরশীল হবে।[27]

অবশ্য সত্যনিষ্ঠ আলিমদের মধ্যে অনেকেই এ আয়াতটিকে সবার ক্ষেত্রেই ব্যাপক বলে মন্তব্য করেছেন।[28]

তাগুতি আইন ও বিধিবিধান প্রণয়নের চাকরি

কোনো শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূলই হলো তার আইনকানুন ও বিধিবিধান। ইসলামি শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূল হলো, আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণয়নের অধিকার একমাত্র আল্লাহ তাআলার। পক্ষান্তরে তাগুতি শাসনব্যবস্থার ভিত্তিমূলই হলো, এই অধিকার মানবমস্তিষ্কের জন্য সাব্যস্ত করা এবং এক ও অদ্বিতীয় উপাস্য আল্লাহ তাআলা থেকে নিরোধ করা। ইসলাম ও গণতন্ত্রের মৌলিক দ্বন্দ্ব হলো, ইসলাম শেখায়, ইলাহ হলেন একমাত্র আল্লাহ। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অপরদিকে গণতন্ত্র শেখায়, ইলাহ হলো একমাত্র জনগণ। 'লা ইলাহা ইল্লান্নাস'। সুতরাং যে ব্যক্তি তাগুতি শাসনব্যবস্থার অধীনে আইনকানুন ও বিধিবিধান প্রণয়নের চাকরি করবে, সে স্পষ্ট কুফরিতে লিপ্ত। কুরআন, সুন্নাহ ও ইজমা দ্বারা তার কুফর প্রমাণিত।

وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ... فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ... فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.

'যারা আল্লাহর নাজিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা করে না, তারাই কাফির..., তারাই জালিম..., তারাই ফাসিক...'।[29]

আল্লাহ তাআলার নাজিলকৃত বিধান অনুসারে ফায়সালা না-করার ক্ষতিই যদি এত ভয়াবহ হয়, তাহলে সেই বিধানের বিপরীত বিধান প্রণয়ন করা ও তা জারি করা কত ভয়াবহ হবে, তা সহজেই অনুমেয়। এ কারণেই সেসব ব্যক্তিবর্গকেও তাগুত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে, যাদের কাছে অন্যরা মানবরিচত বিধান অনুসারে বিচার প্রার্থনা করে।

يُرِيدُونَ أَنْ يَتَحَاكَمُوا إِلَى الطَّاغُوتِ

তারা তাগুতের কাছে বিচারপ্রার্থী হতে চায়।[30]

তাগুত শব্দটি যদিও ব্যাপক; কিন্তু এখানে পূর্বাপর কথা থেকে স্পষ্ট যে, এর দ্বারা শয়তান বা নফস উদ্দেশ্য নয়, পাথরের মূর্তি বা জ্যোতিষিও উদ্দেশ্য নয়; কারণ, তাদের কাছে বিচার প্রার্থনা করা হয় না। এর দ্বারা সেসব মানুষ উদ্দেশ্য, যারা আল্লাহর ফায়সালা ব্যতিরেকে ভিন্ন ফায়সালা প্রদান করে। এজাতীয় ফায়সালাকে কুরআনে জাহিলিয়্যাতের ফায়সালা বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

তারা কি জাহিলিয়্যাতের ফায়সালা কামনা করে? অথচ বিশ্বাসী সম্প্রদায়ের জন্য আল্লাহ অপেক্ষা উত্তম ফায়সালাকারী আর কে হতে পারে![31]

সত্তাগতভাবে হারাম চাকরি

যেসব চাকরি সত্তাগতভাবে হারাম, কোনো মুসলমানের জন্য তো তাতে অংশগ্রহণ করাই বৈধ নয়। উপরন্তু তা দ্বারা যদি তাগুতি শাসনব্যবস্থার সহযোগিতা ও উপকার হয়, তাহলে এটা তো আরও গুরুতর হয়ে যায়। যেমন, সত্তাগতভাবে হারাম চাকরির উদাহরণ প্রসঙ্গে আমরা একটি উদাহরণ উল্লেখ করেছিলাম— ইসলামের বিজয় ছাড়া অন্য কোনো লক্ষ্যে গঠিত বাহিনীতে চাকরি করা। ইমাম সারাখসি রহ.-এর *আল–মাবসুত* গ্রন্থের বক্তব্য থেকে এর বিধান পরিষ্কার হয়ে যায় :

وَإِذَا كَانَ قَوْمٌ مِنْ الْمُسْلِمِينَ مُسْتَأْمَنِينَ فِي دَارِ الْحَرْبِ فَأَغَارَ عَلَى تِلْكَ الدَّارِ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ الْحَرْبِ لَمْ يَحِلَّ لِهَؤُلَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنْ يُقَاتِلُوهُمْ؛ لِأَنَّ فِي الْقِتَالِ تَعْرِيضَ النَّفْسِ فَلَا يَحِلُّ ذَلِكَ إلَّا عَلَى وَجْهِ إعْلَاءِ كَلِمَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاعَزَازِ الدِّينِ، وَذَلِكَ لَا يُوجَدُ هَهُنَا؛ لِأَنَّ أَحْكَامَ أَهْلِ الشِّرْكِ غَالِبَةٌ فِيهِمْ فَلَا يَسْتَطِيعُ الْمُسْلِمُونَ أَنْ يَحْكُمُوا بِأَحْكَامِ أَهْلِ الْإِسْلَامِ فَكَانَ قِتَالُهُمْ فِي الصُّورَةِ لِإِعْلَاءِ كَلِمَةِ الشِّرْكِ، وَذَلِكَ لَا يَحِلُّ.

একদল মুসলমান যদি দারুল হারবে আমান গ্রহণ করে বসবাস করতে থাকে আর সে সময় যদি সেই ভূখণ্ডে একদল হারবি কাফির আক্রমণ চালায়, তাহলে এসকল মুসলমানের জন্য আক্রমণকারী কাফিরদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করা হালাল হবে না। কারণ, যুদ্ধে নিজেকে হুমকির মুখে ফেলা হয়। আর এটা শুধু মহান আল্লাহর কালিমা সমুন্নত করার জন্য ও দীনকে মর্যাদাবান করার জন্যই হালাল হয়। অথচ এখানে সেই উদ্দেশ্য অবিদ্যমান। কারণ, তাদের মধ্যে মুশরিকদের বিধিবিধানই প্রতিষ্ঠিত রয়েছে। তাই মুসলমান ইসলামের অনুসারীদের বিধিবিধানের আলোকে সেখানে ফায়সালা করতে পারবে না। সুতরাং এক্ষেত্রে যুদ্ধ হবে শিরকের কালিমা সমুন্নত করার লক্ষ্যে। আর এটা তো হালাল নয়।[32]

রাসুলুল্লাহ ﷺ যেখানে মুশরিকদের মধ্যে অবস্থানকারী মুসলিম থেকেই সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা দিয়েছেন, সেখানে যারা তাগুতি শাসনব্যবস্থার অধীনে অবস্থান করে; তাদের বিষয়টি সহজেই অনুমেয়। জারির ইবনু আবদিল্লাহ রা. বর্ণনা করেন :

بَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً إِلَى خَثْعَمٍ فَاعْتَصَمَ نَاسٌ مِنْهُمْ بِالسُّجُودِ فَأَسْرَعَ فِيهِمُ الْقَتْلُ – قَالَ – فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَمَرَ لَهُمْ بِنِصْفِ الْعَقْلِ وَقَالَ " أَنَا بَرِيءٌ مِنْ كُلِّ مُسْلِمٍ يُقِيمُ بَيْنَ أَظْهُرِ الْمُشْرِكِينَ " . قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ لِمَ قَالَ " لاَ تَرَاءَى نَارَاهُمَا " .

রাসুলুল্লাহ ﷺ খাসআম গোত্রের বিরুদ্ধে একটি ক্ষুদ্র বাহিনী প্রেরণ করলেন। তখন ওই গোত্রের কিছু লোক সেজদার আশ্রয় নিল। কিন্তু এ সত্ত্বেও তাদেরকে তাড়াতাড়ি হত্যা করা হলো। নবি ﷺ-এর কাছে এ সংবাদ পৌঁছলে তিনি তাদের ওয়ারিশদেরকে অর্ধেক দিয়াত (রক্তপণ) প্রদানের নির্দেশ দিলেন। তিনি বললেন, আমি প্রত্যেক এমন মুসলিম থেকে দায়মুক্ত, যারা মুশরিকদের মধ্যে বসবাস করে। লোকেরা জিজ্ঞেস করল, কেন? তিনি বললেন, (মুশরিক ও মুসলমান একসাথে বসবাস করার অনুমতি নেই)। তারা একে অপর হতে এরূপ দূরত্বে বাস করবে, যাতে একের ঘরে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি অপরের ঘর হতে দেখা না যায়।[33]

মাওলানা আবদুল হাই ফিরিঙ্গি মহল্লি রহ. বৈধ চাকরি ও অবৈধ চাকরির পরিচয় প্রসঙ্গে লেখেন :

جس نوکری میں اجرائے احکام غیر شرعیہ کی اور اجرائے احکام ظلم وغیرہ کی نہ ہو وہ درست ہے اور جن میں یہ امور ہوں وہ حرام ہے۔

যে চাকরিতে শরিয়াহবহির্ভূত বিধিবিধান বাস্তবায়ন এবং জুলুম ও এজাতীয় অন্যান্য বিষয়ের বিধিবিধান প্রয়োগ করতে হয়, তা নাজায়িয। আর যে চাকরিতে এই সমস্যাগুলো থাকবে না, তা জায়িয।[34]

সত্তাগতভাবে হারাম নয় এমন সরকারি চাকরি

সত্তাগতভাবে হারাম নয় এমন সরকারি চাকরির উদাহরণ আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি। বাহ্যদৃষ্টিতে এই ধরনের চাকরির ক্ষেত্রে তো কোনো সমস্যা চোখে পড়ে না। কিন্তু গভীরভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায়, এর দ্বারাও তাগুতি শাসনব্যবস্থার একধরনের সহযোগিতা হয়। হাকিমুল উম্মত মাওলানা আশরাফ আলি থানবি রহ.-এর চিন্তাধারার সবচে নির্ভরযোগ্য ভাষ্যকার মাওলানা আবদুল বারি নদবি রহ. লেখেন :

البتہ نوکریوں میں کم از کم اتنی احتیاط کی ہدایت ہے کہ اگر کوئی اور صورت معاش کا نہیں تو تعلیمات وغیرہ کی ویسی نوکریاں کرو جن میں عدالتی عہدوں وغیرہ کی طرح شریعت کے احکام کی صراحتًا مخالفت نہ کرنا پڑے.

তবে চাকরির ক্ষেত্রে অন্ততপক্ষে এতটুকু সতর্কতার নির্দেশনা রয়েছে যে, যদি জীবনযাপনের অন্য কোনো সুযোগ না থাকে, তাহলে (অপারগ হয়ে) শিক্ষা এবং এজাতীয় অন্যান্য ক্ষেত্র—যেগুলোতে আদালত ও এজাতীয় অন্যান্য দায়িত্বের পদগুলোর মতো স্পষ্টভাবে শরিয়াহর বিধিবিধানের বিরুদ্ধাচারণ করতে হয় না—বেছে নিয়ে এগুলোতে চাকরি করো।[35]

শাহ আবদুল আজিজ মুহাদ্দিসে দেহলবি রহ. কাফির শাসকের অধীনে কাপড় সেলাই করা অথবা পণ্য ক্রয়-বিক্রয় করে দেওয়ার ব্যাপারে বলেন, এগুলো যদিও বাহ্যিকভাবে বৈধ; কিন্তু গভীরভাবে দৃষ্টিপাত করলে প্রতিভাত হয়, এগুলো কোনোটাই হারাম থেকে মুক্ত নয়। এ প্রসঙ্গে তিনি তার ফাতওয়ার

বিস্তারিত আলোচনা করেছেন, কারণগুলোও বিশ্লেষণসহকারে তুলে ধরেছেন।[36] যেখানে একজন মুসলমানের জন্য অপরিহার্য হলো তাগুতকে উৎখাত করা, সেখানে তাদের মদদ করা তো কোনো মুসলমানের কাজ হতে পারে না। মুসলমানদের মাথার ওপর জোরপূর্বক চেপে থাকা এসকল তাগুত নব্য ক্রুসেডার কুফফার গোষ্ঠীর তাবেদার পুতুল ছাড়া কিছু নয়। ঈমানের পরে মুসলিম উম্মাহর ওপর এসকল আগ্রাসী শত্রুকে প্রতিহত করার চাইতে বড় কোনো আবশ্যকীয় বিষয় নেই। শাইখুল ইসলাম ইমাম ইবনু তাইমিয়্যা রহ. বলেন :

العدو الصائل الذي يفسد الدين والدنيا لا شئ أوجب بعد الإيمان من دفعه.

আগ্রাসী শত্রু যে দীন-দুনিয়া উভয় দিকে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে, তাকে প্রতিহত করা ঈমানের পর সবচে বড় দায়িত্ব।[37]

হ্যাঁ, এখন প্রশ্ন আসতে পারে, কেউ যদি সরকারি চাকরি ছাড়তে অপারগ হয়, অর্থাৎ অপারগ হয়ে সরকারী চাকরি করে, তাহলে তার বিধান কী হবে? এ নিয়ে অনেক সংশয় আমাদের প্রচলিত আছে। আমরা এ বিষয়ে স্বতন্ত্র নিবন্ধ প্রকাশ করব ইনশাআল্লাহ। যার শিরোনাম হবে : **'সরকারি চাকরি : অপারগ ব্যক্তির বিধান কী হবে?'**

কৃতজ্ঞতা স্বীকার : মাওলানা সদরুদ্দীন ইসলাহি প্রণীত *নেজামে তাগুত সে বারাআত* পুস্তিকার আলোকে আমাদের এই নিবন্ধটি রচিত হয়েছে।

[1] তাফসিরে বাগাবি ও তাফসিরে মাআরিফুল কুরআন

[2] তাফসিরে মাজহারি

[3] কিফায়াতুল মুফতি

[4] সুরা বাকারাহ : ২৫৬

[5] সুরা মায়িদা : ২

[6] সহিহ মুসলিম : ১৬৯৮, ১৫৯৭

[7] সুনানু আবি দাউদ : ৩৬৭৪

[8] সুরা বাকারাহ : ২৭৫

[9] সুরা বাকারাহ : ২১৯

[10] মুসনাদু আহমাদ : ২১৯৫৯

[11] মুসনাদু আহমাদ : ২৪৫৩

[12] সুরা আলে ইমরান : ১১০

[13] সুরা তাওবা : ৭১

[14] সুরা তাওবা : ৬৭

[15] আল-মুফরাদাত

[16] সুরা তাওবা : ৭৩

[17] সহিহ মুসলিম : ১৯১০

[18] সুরা হুদ : ১১/১১৩

[19] তাফসিরে ইবনে কাসির

[20] মাআনিল কুরআন লিন নাহহাস, কুরতুবি

[21] তাফসিরে কুরতুবি

[22] তাফসিরে ইবনে কাসির ও কুরতুবি

[23] তাফসিরে বাগাবি

[24] তাফসিরে তাবারি

[25] তাফসিরে ইবনে কাসির

[26] তাফসিরে তাবারি

[27] তাফসিরে ফাতহুল কাদির

[28] ইবন তাইমিয়্যা, মাজমুউল ফাতাওয়া : ১৩/২০৩; মিনহাজুস সুন্নাহ : ৬/১১৭

[29] সুরা মায়িদা : ৪৪, ৪৫, ৪৭

[30] সুরা নিসা : ৬০

[31] সুরা মায়িদা : ৫০

[32] কিতাবুল মাবসুত, সারাখসি : ১০/৯৬-৯৭

[33] সুনানু আবি দাউদ : ২৬৪৫; সুনানুত তিরমিজি : ১৬০৪, ১৬০৫

[34] ফাতাওয়া, দ্বিতীয় খণ্ড, ১৬২ নম্বর পৃষ্ঠা, মাতবায়ে ইউসুফি থেকে প্রকাশিত

[35] মাসিক মাআরিফ, জানুয়ারি ১৯৪৭ খ্রিষ্টাব্দ, ৯ম খণ্ড, ১ম সংখ্যা, ৪৭-৪৮ নম্বর পৃষ্ঠা

[36] দ্রষ্টব্য—ফাতওয়া আজিজি, ৪১৬ নম্বর পৃষ্ঠা, এইচ এম সাঈদ কোম্পানি করাচি প্রকাশিত।

[37] আল-ফাতাওয়াল কুবরা